বাঙলা সাহিত্যিক গদ্য

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

ভূমিকা

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙলা গদ্যসাহিত্যর এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখা দেয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে নয়, পূর্ব পাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) সমেত পৃথিবীর সব প্রান্তে বাঙলা লেখকদের হাতে সেই গদ্যরই অনুবর্তন ও বিবর্তন হয়ে চলেছে। অনিবার্যভাবে প্রশ্ন উঠবে: ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে কি গদ্য বলে কিছু ছিল না। এ ব্যাপারে বলা যায়: তার দু-চারটি নিদর্শন থাকলেও সেগুলির সাহিত্যমূল্য নেই। মানে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ প্রভৃতি সেই অর্থে লেখা হয় নি। প্রাগাধুনিক বাঙলা গদ্য আটকে ছিল চিঠি খত চুক্তি হকিকত ভাষ ইত্যাদিতে। বাঙলা বা কোনো নির্দিষ্ট নাম তার ছিল না, শুধুই 'ভাষা' বলে উল্লেখ করা হতো।

পাদ্রি বাঙলা ও ফোর্ট উইলিঅম কলেজের লেখককুলের সংস্কৃত- বা ফার্সি-ঘেঁষা ভাষা বাঙলা গদ্যর বিকাশের ধারায় এমনই খাপছাড়া অধ্যায়মাত্র। রামমোহন, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখের বাঙলা গদ্য প্রাগ্-ইতিহাসের উপাদান।

প্রথম প্রয়াসেই বাঙলা সাহিত্যিক গদ্য সাবালক হয়েছিল: শুরুতে বিদ্যাসাগর- অক্ষয়কুমার আর মধ্যে প্যারীচাঁদ-হুতোমের লেখনীতে। আর তারপর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ- প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সে-গদ্যকে করলেন আরও সুচারু।

উনিশ-বিশ শতকে সমাজসংস্কার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে রাজনৈতিক বিতর্কর ফলে বাঙলা গদ্য অর্জন করল ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা। ব্রহ্মবান্ধবের গদ্য তাই বাঙলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক দিকচিহ্ন হয়ে আছে।

বাঙলা সাহিত্যিক গদ্য গড়ে ওঠার আলোচনার খেই ধরে, এইসব দক্ষ শিল্পীর সুবাদে, এসে পড়ে বাঙলা ভাষার রূপ (সাধু ও চলিত) আর রীতি (উঁচু-মাঝারি-নিচু)-র প্রসঙ্গ; ওঠে তাঁদের ও গদ্যকার বিবেকানন্দর গুরুচাণ্ডালী দোষের কথা। 'উৎকট ব্যতিক্রম' হলেও আসে, বিবর্তনের নিরিখে, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নির্মাণকৌশল। বাদ যায় না আইনি বাঙলা, বটতলার বই থেকে পাঠ্যপুস্তকের ভাষারীতি।

সব মিলিয়ে তেইশটি লেখায় জরিপ করা হয়েছে গত দু শ বছরের গদ্য- ভাষা- সাহিত্যর অভিব্যক্তিকে।

এমন একটি বই বার করার জন্যে পুনশ্চ-কে ধন্যবাদ।

৩ মোহনলাল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৪

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
২২.০২.২০২২

সূচিপত্র

সংক্ষেপ সূচি	....	১১
উইলিঅম কেরি ও বাঙলা গদ্য : একটি অতিকথা	....	১৩
রামমোহন রায় : একটি অল্প পরিচিত রচনা	....	২২
বাঙলা গদ্যসাহিত্যর সূচনাপর্ব	....	৩৩
বাঙলা গদ্য : কী ছিল কী হলো	....	৪৩
আইনি বাঙলা : উইল-এর ভাষা	....	৬৭
প্যারীচাঁদ মিত্র : বাঙলা গদ্যে ও কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা	....	৮৪
আলালি ভাষার সুলুক সন্ধান	....	৮৭
আলালের ঘরের দুলাল : নানা প্রসঙ্গ	....	৯৯
বাঙলা ছাত্রপাঠ্য বইএর তিন আদি লেখক : কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর	....	১০৮
হুতোম-এর ভাষা	....	১১৩
হুতোম-এর রীতিবৈচিত্র্য	....	১২১
হুতোমের পরে বীরবলের আগে : কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের *সংসার-সর্ব্বরী*	....	১২৭
বাঙলা গদ্যর তিন রীতি	....	১৩২
গুপ্তকথা-র গুপ্তকথা	....	১৪৩

বাঙলা গদ্য : সাধু-চলিত ১৫৭
বলার ভাষা আর লেখার ভাষা ১৮৮
চলিত গদ্যর সেকাল-একাল ১৯৬
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য ২০৪
প্রমথ চৌধুরীর গদ্য ২২০
প্রমথ চৌধুরী, চলিত গদ্য আর রাজনীতি ২৩০
সুধীন্দ্রনাথ দত্তর গদ্য ২৪৩
গুরুচাণ্ডাল-চাণ্ডালী ২৬২
বাঙলা চলিত গদ্যর প্রসার : পটভূমি ও পরিণতি ২৭১
রচনাপঞ্জি ২৮১

সংক্ষেপ সূচি

জ্যো-ভ-প্র	জ্যোতি ভট্টাচার্য প্রবন্ধসংগ্রহ
ত্রৈ-র-স	ত্রৈলোক্য-রচনা সংগ্রহ
দে-র	দেশবন্ধু রচনাসমগ্র
প.গ	পরশুরাম গল্প সংগ্রহ
প-গ্র	পরশুরাম গ্রন্থাবলী
প্যা-র	প্যারীচাঁদ রচনাবলী
প্র-চৌ-প্র	প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ
প্র-পা-র	প্রশান্ত পাল রবিজীবনী
ব.	বঙ্গাব্দ
ব-র	বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ
বা-সা-ই	বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস
বি-বা-র	বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা
বি-র	বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ
ব্র-উ-র	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ
ভা-গ্র	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী
মৃ-গ্র	মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী
র-র	রবীন্দ্র-রচনাবলী
রা-র	রামমোহন রচনাবলী
রা-সু-র	রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র
শ-র	শরৎ রচনাবলী

শি-অ	শিবরাম অমনিবাস
স-হু	সটীক হুতোম
সা-প-প	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
সা-সা-চ	সাহিত্য-সাধক চরিতমালা
সু-দ-কা	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যসংগ্রহ
সু-দ-প্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধসংগ্রহ
সু-মু-গ	সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহ
সু-সা	সুকুমার সাহিত্যসমগ্র
হ-র	হরপ্রসাদ রচনাবলী
হু-প্যা-ন	হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা
BR	Bankim Rachanavali
DLB	Dictionary of Literary Biography
GCW	Gandhi Collected Works
REW	Roy English Works
SBE	Sacred Book of the East

উইলিঅম কেরি ও বাঙলা গদ্য : একটি অতিকথা

অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন চট্টগ্রামের সরকারি মহাবিদ্যালয়ে। তখন বাঙলা পরীক্ষারও প্রশ্ন হতো ইংরিজিতে। কলেজের পরীক্ষায় জনার্দনবাবু একটি প্রশ্ন দিয়েছিলেন। তার বিষয় : বাঙলা গদ্যর বিকাশে ইওরোপীয় মিশনারিদের দান। প্রশ্নটি পড়ে সায়েব অধ্যক্ষ, রিচার্ড কেরি ব্যাম্‌স্‌বটম ঐ বিষয়ে জনার্দনবাবুর কাছে আরও জানতে চান (১৩৯৯, ৯১)।

বাঙলা গদ্যে উইলিঅম কেরি প্রমুখ মিশনারিদের স্থান ও দানের ব্যাপারে বাঙলা সাহিত্যর প্রায় সব ইতিহাসকারই মোটের ওপর একমত। প্রায় সকলেই বলেন : সায়েব মিশনারিদের ভাষা যতই অস্থির হোক, বাঙলা গদ্যর গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁদেরই উদ্যোগে। ফোর্ট উইলিঅম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্‌শিদের দিয়ে তাঁরা অনেককটি বই লিখিয়েছিলেন। ছাপাখানাও চালু হলো তাঁদেরই হাতে। আর তার ফলেই বাঙলা গদ্যরচনার প্রকাশ ও প্রচারের পথ খুলে গেল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিম, ... এঁরা তারই ধারক।

এখন এর উল্‌টো কথা শুনলে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হবেন। তবু সবিনয়ে, কিন্তু অবিচলভাবে, বলব : কেরি ও তাঁর পরিজনদের সম্পর্কে প্রচলিত মতটি ভুল; অপাত্রে গৌরব অর্পণ করা হচ্ছে। ঘটনা এই যে, বাঙলা গদ্যর ঐতিহাসিক বিকাশে ইওরোপীয় মিশনারি ও তাঁদের আশ্রিত বাঙালি লেখকদের দান একেবারেই শূন্য। অবশ্যই বাঙলা গদ্যর কালপঞ্জিতে তাঁদের নাম থাকবে—তথ্যকে অস্বীকার করব কেন? কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে গোটা ফোর্ট উইলিঅম কলেজ পর্বটি (১৮০১-৫৪) একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়মাত্র। ইংরেজ-পূর্ব বাঙলাতেও গদ্য লেখা হতো, শুধু গৌড়বঙ্গে নয়, অসমে, এমনকি ভুটানেও (সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪২, ৮৪)। উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙলা লেখার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখা দেয়, এখনও সেটিই বহাল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা সাধারণভাবে ভারতে নয়, পূর্ব পাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ) সমেত পৃথিবীর সব প্রান্তে বাঙলা লেখকদের হাতে সেই গদ্যরই অনুবর্তন ও বিবর্তন হয়ে চলেছে। ব্যাকরণগত বিচারে সাধু ও চলিত এই দুটি লিখিত রূপ এখনও পাশাপাশি রয়েছে, দুই রূপেই উঁচু,

মাঝারি ও নিচু রীতিতে লেখা যায় ও হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাঙলা গদ্যর এই অভিব্যক্তিতে মিশনারিদের গরহাজিরাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

কেন একথা বলছি? সে-উত্তরে যাওয়ার আগে ঐতিহাসিক আর প্রাচীনত্বর কারবারি (*অ্যান্টিক্যুয়ারিয়ান*)-র তফাতটা বুঝে নেওয়া দরকার।

তত্ত্বকথার বদলে বরং একটি গল্প বলি। ফরাসি মধ্যযুগ-বিশারদ আঁরি পিরেন একবার সুইডেন-এর রাজধানী স্টকহোল্‌ম-এ গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি চললেন নতুন পৌরভবনটি দেখতে। কেন? তাঁর উত্তর : 'আমি যদি প্রাচীনত্বর কারবারি হতুম তবে আমার নজর থাকত শুধুই পুরনো জিনিসের দিকে; কিন্তু আমি ঐতিহাসিক, জীবনকে আমি তাই ভালোবাসি' (ব্লশ 1967 [10])। যেসব বিশেষজ্ঞ 'মধ্যযুগ' ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না তাঁদের কাছে মার্ক ব্লশ তাঁর মাস্টারমশাই-এর এই গল্পটি বলতেন।

যথার্থ ঐতিহাসিক অতীতকে দেখেন বর্তমানের চোখ দিয়ে। তাঁকে ঠিকমতো ঘটনা-বাছাই শিখতে হয়। কীসের বাছাই? অতীতে রোজ কত কিছু ঘটেছে। তার সবই ইতিহাসের উপাদান নয়। তা-ই যদি হতো তাহলে যে-কোনো এক বছরের খবরের কাগজ আগাপাশতলা ছেপে দিলেই সেটি ঐ বছরের ইতিহাস হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না। নির্বিচারে সব ঘটনাকেই 'ঐতিহাসিক' বলা যায় না। ঘটার পরে যে-ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়েছে সেই ঘটনাই ইতিহাস-লেখকের কাঁচামাল। তেমন ঘটনা বাছাই করে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস লেখেন। ইতিহাস অনেকটাই ঐতিহাসিকের সৃষ্টি—আগাগোড়া পক্ষপাতশূন্য বিষয়মুখী ইতিহাস বলে কিছু হয় না। ঘটনার বাছাই, শব্দর প্রয়োগ ইত্যাদি দিয়েই বিষয়ীর ঝোঁক ধরা পড়ে যায়। (কার ২০০৬, ১৪-২১)

ইংরিজিতে *ক্রসিং দ রুবিকন* (রুবিকন বলে জলধারা পেরনো) একটি চালু প্রবাদ। মানে হলো : যে সিদ্ধান্ত নিলে আর ফেরা যায় না। ইতালি আর গল-এর মধ্যে এই জলধারাটি ছিল দু-দেশের সীমানা। জুলিয়াস সিজার খ্রিপূ ৪৯এর একদিন সেটি পেরোলেন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। সিজার-এর আগে ও পরে হাজার হাজার মানুষ ঐ জলধারা এপার-ওপার করেছেন। কিন্তু তার কোনোটাই ইতিহাসের তথ্য নয়। সিজার যখন ঐ জলধারা পেরোলেন তখন সেটি ইতিহাসের তথ্য হয়ে উঠল। (কার ২০০৬, ৫)

হাজার হাজার লোকের রুবিকন পেরনোর মতোই কেরি প্রমুখ মিশনারিদের বাঙলা গদ্যচর্চা একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা। তাঁর আগে ও পরে অনেকেই গদ্য লিখেছেন, কমবেশি নিষ্ঠাভরেই তাঁরা সে-কাজ করেছেন, কিন্তু বাঙলা গদ্যর কাঠামো তাতে গড়ে ওঠে নি। তাঁদের রচনাভঙ্গি কেউ অনুসরণ করেন নি, কেউ তাঁদের গদ্য নিয়ে তেমন চড়া ব্যঙ্গও করেন নি। উল্‌টে বলা যায় : কেরি ও তাঁর উত্তরসূরিদের বাইবেল অনুবাদ ও অন্যান্য পুস্তিকা নিয়ে লোকমুখে কিছু কৌতুক চালু হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাই লিখতে

পেরেছিলেন : 'মহাপ্রভু পাদ্রি কেরী প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময় বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক কয়েকখানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব গন্ধই নির্গত হইত।' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৯, ৪৮ এ উদ্ধৃত)

শুধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কেন, ব্যাপ্টিস্ট অনুবাদক জন ওয়েঙ্গার, ক্যাথলিক মিশনারি আবে দুবোয়া ও রামমোহন রায় থেকে শুরু করে একালে সুকুমার সেন ও মিনতি মিত্রও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[১] তবু কেউ কেউ বলে থাকেন : প্রথম সংস্করণে (১৮০১) বাইবেল-অনুবাদ যেমনই হোক, পরের সংস্করণগুলিতে বারবার শোধন করার ফলে তার ভাষা তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল হয়েছে। কেরি-র কোনো কোনো অনুরাগী তাঁকে বাঙলা বাইবেল-এর উইলিয়ম টিন্ডাল (১৪৯৪-১৫৩৬) ও জন উইক্লিফ (আনু. ১৩৩০-১৩৮৪) বলে দাবি করেছেন। (মিনতি মিত্র ২০০৪, ৫৯এ উল্লিখিত)

এমন সুখ্যাতির মধ্যে সত্য কতটুকু? টিন্ডাল-এর অনুবাদ ইংরিজি গদ্যর ইতিহাসে দিক্‌চিহ্ন হয়ে আছে। ১৬১১য় বহু অনুবাদক ও ভাষাবিদের যৌথ প্রচেষ্টায় যে-অনুবাদ বেরিয়েছিল তার দশভাগের ন ভাগই টিন্ডাল-এর প্রতিধ্বনি (ব্রুস 1963, 44)। চরম প্রতিকূল পরিবেশে একা টিন্ডাল যে-কাজ করেছিলেন, সতেরো শতকের গোড়ায় অতজন মিলেও তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ১৬১১র সেই 'অনুমোদিত অনুবাদ' (যাকে 'রাজা জেমস-এর অনুবাদ', *কিং জেমস ভারসন*-ও বলা হয়, যদিও দুটি নামই তথ্যর দিক দিয়ে অসত্য) সাধারণভাবে ইংরিজি ভাষার বিকাশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। কেরি-র অনুবাদ—একা কেরি অবশ্য সব অনুবাদ করেন নি, তাঁর সহযোগীও ছিলেন অনেক—এমনকি বাঙালি খ্রিস্টান মহলেও অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। বাঙলা গদ্যর বিকাশে কেরি তথা ফোর্ট উইলিঅম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্‌শিদের রচনার কোনো ছাপই পড়ে নি। রামমোহন তাঁর নিজের মতো করে বাঙলা গদ্যর ছাঁদ তৈরি করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিকেই তাঁর নজর ছিল পুরোপুরি। প্রসাদগুণ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই প্রথম বাঙলা গদ্যর অন্বয় ধরতে পেরেছিলেন। সেই বোধ তাঁদের আগেকার কোনো লেখকের মধ্যেই দেখা যায় না। প্রমথ চৌধুরী সঠিকভাবেই বিদ্যাসাগরের এই দিকটিকে শনাক্ত করেছেন (প্র-চৌ-প্র ১ ১৯৫৭, ৩২৪)। তিনি অবশ্য অক্ষয়কুমারের কথা বলেন নি, কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্যর কারণে অক্ষয়কুমারও সমান স্মরণীয়।

হালে কেরি সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য : 'কেরি বাঙলা ভাষার যত বড়ো সেবক ছিলেন, তত বড়ো লেখক ছিলেন না' (1998, 97)। এমন বলার কারণ কী? প্রদ্যুম্নবাবু দেখিয়েছেন : 'কেরির মৃত্যুর মাত্র বছরখানেক আগে তাঁর অনূদিত বাইবেলের যে শেষ সংস্করণটি (1833) বেরোয়, সেটা পড়লে বুঝতে পারি, নিখাদ বাঙলা বাগ্‌ভঙ্গি আর বাকস্পন্দ এই শেষ বয়সেও তাঁর ঠিক দখলে আসে নি।' (1998, 98)

কথাটি তাঁর আগে সুকুমার সেনও বলেছিলেন। কেরি-র নামে ছাপা *কথোপকথন* প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'নাই অর্থে "নহে" পদের অপপ্রয়োগও কেরির সন্দেহ নাই, কেননা